Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
UGC Enlisted Serial No. 48666
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-I, July 2018, Page No. 135-141
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

শিবরাম চক্রবর্তীর গোয়েন্দাধর্মী এবং ভৌতিক ছোটোগল্প : একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

Mistu Roy
Research Scholar, Dept. of Bengali, Tripura University, Agartala, Tripura

Abstract

Detective story is such kind of story where we will find/face any crime or any mysterious incident. One or more than one person using their rational, intelligence, intellectual mind do collects clue and data from various sources and identify the criminal. The person who holds a major role to identify the criminal is called detective and that type of story is called detective heterogeneous story. To stimulate/incite the teenager many Bengali laureates has written detective story as well as horror/ghostly story. Shibram Chakrabarty (1903-1980) is one of them. Shibram's detective heterogeneous short stories are- kalkekashir kando, kalkekashir obak kando, itorbishesh, shutro, Alexendarer digbijoy etc. His ghostly/horror heterogeneous short stories are –bhute biswas koro, lokkhon ebong durlokkhon, bhut na odbhut, ek bhuture kando, bajikorer digbaji etc. In my article searchlight will be thrown to the above mentioned topic.

গোয়েন্দা কাহিনি হল এমন গল্প যেখানে কোনো অপরাধ বা রহস্যজনক ঘটনা থাকে। ঘটনার মূল সত্যতা লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করে এবং অধিকাংশ সময়ে নির্দোষের উপর সন্দেহ করা হয়। ঘটনার সত্যতা জানার জন্য পাঠক টানটান উত্তেজনা অনুভব করে। কাহিনিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে বিভিন্ন রহস্য সমাধানের সূত্র। কোনো একজন বা একাধিক ব্যক্তি মিলে শাণিত বুদ্ধির দ্বারা সূত্রগুলি একত্রিত করে সত্য সন্ধান করে এবং দোষীকে সনাক্ত করে। যে ব্যক্তি দোষী সনাক্ত করার কাজটি সমাধা করে তাকে বলা হয় গোয়েন্দা আর এই ধরনের গল্পকে বলা হয় গোয়েন্দাধর্মী গল্প।[১]

কিশোরদের জন্য প্রথম গোয়েন্দা কাহিনি লেখেন হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (১৮৬২-১৯৩৮)। *সখা ও সাথী* মাসিক পত্রিকায় তাঁর *আশ্চর্য হত্যাকাণ্ড* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সালে। সেসময়ের অপর একজন খ্যাতনামা গোয়েন্দাকাহিনিকার হলেন দীনেন্দ্রকুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪৩)। তাঁর *রহস্য লহরী* সিরিজ সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। দীনেন্দ্রকুমারের লেখার বৈশিষ্ট্য হল তিনিও পাঁচকড়ি দে'র মতো বিদেশি গল্প থেকে মালমসলা নিতেন, অনেক সময় তাঁর গল্পের পটভূমি হত বিদেশের বিভিন্ন স্থান। ১৯২৮ সালে *রামধনু* পত্রিকায় *পদ্মরাগ* গল্পে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের (১৯০৩-১৯৩৯) সৃষ্ট জাপানী গোয়েন্দা *হুকাকাশি* অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করে। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের (১৮৮৮-১৯৬৩) প্রথম গোয়েন্দা গল্প প্রকাশিত হয় *মৌচাক*এ ১৯৩০ সালে। আধুনিক গোয়েন্দা গল্পকার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০) গোয়েন্দা গল্প জগতে জয়ধ্বজা উড়িয়ে দেন ১৯৩৯ সালে তাঁর *সত্যান্বেষী* দিয়ে। তাঁর গোয়েন্দা চরিত্র ব্যোমকেশ বক্সী এবং সহকারী অজিত। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়

লেখক নিজেই কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ডিটেকটিভ ব্যোমকেশ বক্সীর লোকপ্রিয়তা গগনচুম্বী, বিভিন্ন ভাষায় তাঁর কাহিনি চলচ্চিত্রের রূপলাভ করেছে।

দেব সাহিত্য কুটির এর হাত ধরে প্রকাশিত *কাঞ্চনজঙ্ঘা, প্রহেলিকা, বিশ্বচক্র, পিরামিড* ও *কৃষ্ণা* সিরিজ – গোয়েন্দা সাহিত্যকে কিশোরদের কাছে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছে। পূর্বোল্লিখিত লেখকদের ছাড়া অন্যান্য প্রখ্যাত গোয়েন্দা গল্পকাররা হলেন- নীহার রঞ্জন রায় (১৯০৩-১৯৮১), গজেন্দ্রকুমার মিত্র (১৯০৮-১৯৯৪), শশধর দত্ত, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (১৯০৫-১৯৬৩), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪), শৈলবালা ঘোষজায়া, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (১৯০৫-১৯৭২) প্রমুখ। বাংলা সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গোয়েন্দা গল্পে বিপ্লব নিয়ে প্রবেশ করেন সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২)। তাঁর সহজ-সরল বর্ণনাভঙ্গি শুধু কিশোরদেরই নয় বড়োদেরও সমানভাবে আকর্ষণ করেছে। তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দা ফেলুদাকে নিয়ে অনেক চলচ্চিত্র করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে মূলত কিশোরদের জন্যই গোয়েন্দা গল্প লেখা হয়েছে। যদিও বড়োরা সমানভাবে এই গল্প উপভোগ করে থাকে কিন্তু শুধু বড়োদের জন্য খুব কম সংখ্যক লেখকই গোয়েন্দা গল্প লেখার উদ্দেশ্যে কলম ধরেছেন।

কিশোরদের উদ্দীপ্ত করার জন্য বাংলা সাহিত্যে আরও অনেকেই গোয়েন্দা কাহিনি রচনা করে গেছেন, শিবরাম চক্রবর্তীও (১৯০৩-১৯৮০) বাদ যাননি। শিবরাম নিজেকে ছোটোদের লেখক বলতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। নিজের পাঠক সম্পর্কে বলেছেন—

আমার লেখা কী ধরনের ছোট বড়রা পড়ে বলব? যারা সত্যিকারের ছোট নয়, আকারে ছোট কিন্তু প্রকারে বড়, বয়সে বারো কিন্তু মনের বাড় তার ঢের বেশি – আসলে ভেতরে ভেতরে তারা যুবকই বলতে গেলে। প্রায় যুবক, কিংবা যুবকপ্রায় – যাই বলুন। তারাই আমার লেখায় রস পায়। আর বড়দের কথা শুধোচ্ছেন? যারা বয়সে অনেক বেড়ে গেলেও অন্তরে সেই শিশুটি কি কিশোরই রয়ে গেছে – মনের দিকে বদলায়নি বিশেষ – আমার বড়দের লেখা কেবল তাঁরাই পড়ে থাকেন।[২]

শিবরাম চক্রবর্তী বিশ্বাস করতেন ছোটোরা বড়দের চেয়ে অনেক বেশি বোঝদার। তাই তাঁর লেখার একটা বড়ো অংশ ছোটোদের জন্য লেখা। তথাকথিত অনেক সমালোচকের মতে শিবরাম চক্রবর্তী গোয়েন্দা গল্প লেখেননি, তাই তিনি কিশোর সাহিত্যিক হয়ে উঠতে পারেননি। যে কারণে শিবরামের সময়ে কিশোরদের জন্য উদ্যোগ নিয়ে সেরা গোয়েন্দা কাহিনি ছাপা হয় *কাঞ্চনজঙ্ঘা* সিরিজ সেখানে দুঃখের বিষয় তাঁকে ডাকা হয়নি লেখার জন্য। তা সত্ত্বেও শিবরাম কিন্তু থেমে থাকেননি। তিনি রচনা করেছেন অনেকগুলি গোয়েন্দা গল্প। শিবরাম চক্রবর্তীর গোয়েন্দা গল্পের মধ্যে রয়েছে- *কঙ্কেকাশির কাণ্ড, টিকটিকির ল্যাজের দিক, বর্মার মামা, কঙ্কেকাশির অবাক কাণ্ড, সূত্র, ইতরবিশেষ, আলেকজান্ডারের দিগ্বিজয়* প্রভৃতি গল্প। তাছাড়াও সম্পূর্ণ গোয়েন্দা গল্প না হলেও গোয়েন্দাধর্মী কিছু গল্প রয়েছে, যেমন- *গদাইয়ের গোয়েন্দাগিরি, অমলের গোয়েন্দাগিরি, এক মেয়ে ব্যোমকেশের কাহিনি, অবাঞ্ছনীয় উপসংহার* প্রভৃতি গল্প। উল্লেখিত গল্পগুলি উপন্যাস এবং ছোটোগল্পের সমষ্টি। আমাদের আলোচনায় আমরা শিবরামের ছোটোগল্পগুলিকে স্থান দিয়েছি।

শিবরাম চক্রবর্তী গোয়েন্দা কাহিনিতেও রেখে গেছেন *শিব্রামীয়* ছাপ। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের গল্পের ডিটেকটিভ *হুকাকাশির* অনুসরণেই তৈরি শিবরামের *কঙ্কেকাশি*। কঙ্কেকাশি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন গোয়েন্দাগিরির দ্বারাও কিভাবে হাসির সুড়সুড়ি দেওয়া যায়। শিবরামের লেখা গোয়েন্দা গল্পে রহস্য-রোমাঞ্চ, তীক্ষ্ণ ও শাণিত মেধার প্রয়োগ কম দেখা যায়। এখানেও তিনি হাস্যরসের ছাপ রেখেছেন।

কঙ্কেকাশির কাণ্ড ছোটোগল্পে দেখা যায় গোয়েন্দা কঙ্কেকাশি, প্রফুল্ল এবং সমাদ্দার মূলত এই তিনজন। মিঃ ব্যানার্জী আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিলেতে আটকে গেলে তার নমিনেশন পেপার মেইল করে পাঠান বোম্বেতে, যা এ্যাটর্নি

গলস্টোন কোম্পানির জিম্মায় আছে। এই মিঃ ব্যানার্জী হলেন *ফ্লু-ফ্লুকস-ফ্যান* দলের পাণ্ডা, অপরদিকে *বাই হুক অর ক্রুক* দলের নেতা মিঃ সরকার। প্রফুল্লকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এই কাগজ গলস্টোন অফিস থেকে নিয়ে আঠারো তারিখের আগে কলকাতার নমিনেশন পেপার ফাইল করার জন্য। বিষয়টা দেখাশোনার জন্য নামজাদা গোয়েন্দা কল্কেকাশিকে নিয়োগ করা হয়। মিঃ সরকার সমাদ্দারকে নিযুক্ত করেন যেকোনোভাবে যাতে এই নমিনেশন দাখিল না হয়।

কল্কেকাশি সমাদ্দারের পূর্ব পরিচিত কথা প্রসঙ্গে প্রফুল্ল কেন এসেছে, কখন কার কাছ থেকে পেপার নেবে, কোন হোটেলে উঠেছে যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য জানায় সমাদ্দারকে। কল্কেকাশির কাণ্ডে প্রফুল্ল বিরক্ত হয়। গল্প পাঠের সময় পাঠক মনেও কল্কেকাশির দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। দেখা যায় কাগজ আনতে যাওয়ার সমাদ্দার প্রফুল্লর পিছু নেয় এবং তার পিছু নেয় কল্কেকাশি। কল্কেকাশি কাজের অজুহাতে সেখান থেকে চলে আসে, সমাদ্দার কিন্তু পিছু ছাড়েনা। প্রফুল্লকে অনুসরণ করে হোটেলে তাদের পাশের ঘরটি ভাড়া নেয়। সেখানেও কল্কেকাশি সমাদ্দারকে জানায় যে প্রফুল্ল নিজের কোটের লাইনিং-এর ভেতর রেখেছে মূল্যবান কাগজটি। প্রফুল্ল মনে মনে ক্ষুব্ধ হয় তার বোকামিতে। খাওয়া দাওয়ার পর সবাই যখন দাবা খেলায় ব্যস্ত তখন গরম লাগার কারনে প্রফুল্ল গায়ের কোট খুলে রাখে সমাদ্দারের কোটের পাশে। সেই সুযোগে সমাদ্দার কাগজটি সরিয়ে ফেলে। প্রফুল্লর সন্দেহ হয় কল্কেকাশি তার সঙ্গে মিলিত।

সমাদ্দার তার সুটকেসে আসল কাগজের পরিবর্তে নকল কাগজ রেখে দেয়। কল্কেকাশি ঘর তল্লাশি করে নকল কাগজ উদ্ধার করে প্রফুল্লকে দিয়ে দেয়, সমাদ্দার ঘটনার সত্যতা প্রমাণের জন্য কৃত্রিম রাগের অভিনয় করে। যথাসময়ে সবাই ফিরে যায় কলকাতায়। কাগজ জমা হওয়ার কিছু আগে কল্কেকাশি আসে সমাদ্দারের সঙ্গে দেখা করার জন্য। কল্কেকাশির মুর্খামিতে হাসি পায় সমাদ্দারের, কল্কেকাশি এতবড়ো একজন গোয়েন্দা হয়ে তার চালাকি ধরতে পারেনি। এবার আসে রহস্যোন্মুচনের পালা। আসল কাগজটি প্রথম থেকেই ছিল কল্কেকাশির কাছে, প্রফুল্লর কাছে প্রথম থেকে যে কাগজ ছিল সেটি সমাদ্দারকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে, যাতে সে আসল কাগজের দিকে নজর দিতে না পারে। সমাদ্দার যখন প্রফুল্লকে নিয়ে ব্যস্ত তখন কল্কেকাশি আসল কাগজ সংগ্রহ করে সময় মতো জমা দিয়ে দেয়।

কল্কেকাশিকে সমাদ্দার যত কাঁচা খেলোয়াড় বলে ভেবেছে সে তত বোকা সে নয়। কল্কেকাশিকে বোকা ভেবে সে নিজেই বোকামির পরিচয় দিয়েছে। কল্কেকাশি একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা, তাকে অবমূল্যায়ন করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। সমাদ্দার নিজেই হাস্যাস্পদ হয়ে গেছে।

আলেকজেন্ডারের দিগ্বিজয় সম্পূর্ণভাবে গোয়েন্দা গল্প না হলেও একে গোয়েন্দাধর্মী গল্প বলা যায়। আলেকজেন্ডারের কীর্তি কাহিনি নিয়ে লেখা এই ছোটোগল্পটি। এই আলেকজেন্ডার ইতিহাসের আলেকজেন্ডার নয়, এক স্কুলছাত্র, তার আসল নাম লুপ্তপ্রায়, মাস্টার মশায়ের দেওয়া আলেকজেন্ডার নামেই সে পরিচিত। আলেকজেন্ডারের ডিটেকটিভ বইয়ের প্রতি ঝোঁক ছিল। ডিটেকটিভ বই পড়ে পড়ে তার ধারণা হয়েছে সেও একজন উৎকৃষ্ট গোয়েন্দা হতে পারে। কিন্তু তাকে কেউ কোনো ঘটনার তদ্বির করতে দেয় না। গ্রামে অনেক চুরি হচ্ছে, আলেকজেন্ডার জানে সে চোরকে ধরতে পারবে কিন্তু তাকে কেউ ডাকেইনা, এমনকি তার হোস্টেলের কলের স্টপারটি হারিয়ে যাবার পর হোস্টেলের সুপার তাকে তদন্ত করতে দেয়নি। এর থেকে আলেকজেন্ডারের সন্দেহ হয় তাদের সুপার দোলগোবিন্দবাবুই সব চুরির পেছনে আছেন। ভোজপুরী কুন্দনসিং-এর ঘরে চুরি হলে সেখানে গিয়ে আলেকজেন্ডার প্রাথমিক তদন্ত করে এবং কুন্দনসিংকে আশ্বস্ত করে সে চুরকে ধরবেই। হোস্টেলে সবাই ঘুরতে যাওয়ার সময় সে অসুস্থতার বাহানায় যাওয়া নাকচ করে দেয়। কারন সুপারের অবর্তমানে সে তার ঘর তল্লাসি করার সুযোগ পাবে। রাতের বেলা যখন বাইরে থেকে খাওয়া দাওয়া সেরে হোস্টেলে আসে তখন সে কিছু ছায়ামূর্তি দেখে খাবার ঘরে। ভয় পেয়ে সে দৌরে হোস্টেল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় চলে যায়, যাবার সময় সদর

দরজা বাইরে থেকে লাগিয়ে দূরে ল্যাম্পপোস্টের নিচে দাড়িয়ে ভূতের কার্যকলাপ দেখতে থাকে। পরদিন ভোরে পুলিশের কর্মচারী এসে দুইজন চুরকে গ্রেপ্তার করেন এবং তাদের সাহায্যে তাদের দল আটক হয়। তাদের কাছ থেকে চুরি যাওয়া সামগ্রী সব উদ্ধার হয় এমনকি কুন্দনসিংয়ের আসবাব এবং তাদের হোস্টেলের স্টপারটিও। দোলগোবিন্দবাবু ফিরে এসে তাকে অনেক বাহবা দেন এবং তার কীর্তিকাহিনি দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে তার কাছ থেকে গোয়েন্দা বই চান। আলেকজেন্ডার মনে মনে অপরাধ-বোধে ভোগে অযথা সুপারকে সন্দেহ করায়, আর বলে—

না স্যার, ওসব বই পড়লে বরং বুদ্ধি আরো গুলিয়ে যায়, এত লোকের উপর এমন বাজে সন্দেহ হয় আর এরকমের ভুল বোঝায় ! ওতে আগাগোড়া সব মিথ্যে কথা। না: আমি আর ডিটেকটিভ বই পড়ছি না।[৩]

কারন একমাত্র সে জানে কি করে চুর ধরেছিল। গোয়েন্দাগিরি করে নয় বরং ভয়ে আত্মগোপন করতে গিয়ে তার গোয়েন্দা কীর্তিটি ঘটিয়েছে। শিবরাম চক্রবর্তী হাস্যরসের অন্তরালে একটি গভীর সত্য সবার সামনে তুলে ধরেছেন- যেকোনো কিছুরই অন্ধ অনুকরণ করলে তা ফলপ্রদ হয়না উল্টো ঝামেলার সৃষ্টি করে। শুধু অনুকরণ বা অনুসরণ না করে বিষয়টি আত্মস্থ করতে হয়।

উপরোক্ত গল্পগুলি ছাড়াও *গদাই-এর গোয়েন্দাগিরি,* এবং *অমলের গোয়েন্দাগিরি*-তে গদাই, অমল, গিরীনদের মতো শিক্ষানবিশ গোয়েন্দাদের গোয়েন্দাগিরির কাহিনি রয়েছে। *গদাই-এর গোয়েন্দাগিরি* গল্পে দেখা যায় গল্পকার শিবরাম চক্রবর্তী শ্রীমান গদাইকে দিয়ে সূত্রধারের কাজ করিয়েছেন। আদর্শ গোয়েন্দা গল্প কি করে লিখতে হয় সেটা বলতে গিয়ে গল্পের রস কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। গল্পের শুরুতেই দেখা যায় মুরারি নিরুদ্দেশ, গোয়েন্দা গদাই প্রথমে ব্যাপারটি আবিষ্কার করে। চারটি ঘটনাকে এক যোগসূত্রে বাধে গদাই, যথা- ১ম; দুটো সাতচল্লিশে সে মুরারিকে দেখেছিল স্যাঁতসেঁতে রাস্তা দিয়ে একজন কটাচুলওয়ালা লোকের পিছু পিছু যেতে, ২য়; পরদিন ইস্কুলে লক্ষীচাঁদ রৌপ্য পদক স্পোর্টসে তার দৌড়োবার কথা আর দৌড়ে সেই প্রথম হবে, ৩য়; ঐ একই খেলায় কটাচুলের একটি ছেলেও অংশগ্রহণ করছে, ৪র্থ; কটাচুল ছেলের বাবা কটাচুলওয়ালা নিশ্চয়ই চাইবেনা খেলায় নিজের ছেলের পরিবর্তে অন্য কেউ জয়লাভ করুক।

গদাই গিরীনের কাছে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করে এবং মুরারির জুতার চিহ্ন অনুসরণ করে বেরিয়ে পরে তাকে উদ্ধার করার জন্য। গঙ্গার ঘাটে পৌঁছে কটাচুলওয়ালা লোকটিকে নৌকায় বসে থাকতে দেখে। গদাইকে অবাক করে দিয়ে মুরারি নিজে হাজির হয় বজরায়। আসলে কটাচুলের ব্যক্তিটি লক্ষ্মীচাঁদবাবু যিনি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। বিগত তিন বছর ধরেই আর্থিক মন্দার জন্য তিনি নতুন পুরস্কার কিনতে পারেননা তাই আগের দিন মুরারির কাছ থেকে পদকটি চেয়ে নেন আবার পরদিন মুরারি প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে পদক ফিরিয়ে নিয়ে আসে।
প্রথম থেকেই মুরারির দেওয়া চকোলেট খেয়ে গা গোলাচ্ছিল গদাইয়ের। সত্য দর্শনের পর গদাইর উক্তি-

ওই দৃশ্যের পর এই বাক্য শুনে আর আমি আত্মসম্বরণ করতে পারলাম না। ওয়া- ওয়াক্-।[৪]
গদাইয়ের বমি করা-ই স্বাভাবিক, শুধুমাত্র সন্দেহের বশে সে তিলকে তাল ভেবে এতদূর এসেছে। শেষ পরিণামে হতাশ হয়ে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। গোয়েন্দাগিরি মানে শুধু শুধু কাউকে সন্দেহ করা নয়। মুরারির স্বল্প সময়ের জন্য অন্তর্ধান থেকে শুরু করে মুরারির দেওয়া চকোলেটের মত তুচ্ছাতিতুচ্ছ সাধারণ বিষয়গুলিও তার সন্দেহের আওতা থেকে বাদ যায়নি। ফলস্বরূপ হাস্যাস্পদ হতে হয়েছে তাকে।

অমলের গোয়েন্দাগিরি গল্পে কিশোর অমল নিজেকে শার্লক হোমসের চেলা মনে করে। বিভিন্ন গোয়েন্দা কাহিনি পড়া তার নেশা। রাস্তায় একজন আবেগময় লোকের পকেট বই খোঁজে দিতে সাহায্য করে অমল। উক্ত লোকটি চিঠি জমা দিতে এসে পকেট বই হারিয়ে ফেলেছে তাই হাতে চিঠি নিয়ে ডাকবাক্সের আশেপাশে ঘুরে ঘুরে কান্নাকাটি করছিল। তার পকেট বইয়ে শুধু টাকা নয় তার মৃত মেয়ের একমাত্র ছবি ছিল। অমল লোকটিকে জিজ্ঞেস

করে জানতে পারলো সে চিঠি জমা দিয়েছে বাক্সে আর তখন তার পকেট বইটি হারিয়ে গেছে। আসলে লোকটি চিঠির বদলে পকেট বইটি ডাকবাক্সে জমা দিয়ে দিয়েছে ব্যাপারটা বুঝতে অমলের খুব বেশি সময় লাগলনা। লোকটি বলেছিল পকেট বইটি খুঁজে দিলে বইটিতে যত টাকা আছে তার অর্ধেক অমলকে দিয়ে দেবে। ডাকপিয়ন ডাকবাক্স খুলতে আসলে অমল লোকটিকে জানায় তার পকেট বই ডাকবাক্সেই আছে। বইটি পাওয়ার পর আবেগে আপ্লুত হয়ে সবগুলি টাকা অমলকে আর বইটি ডাকপিয়নকে দিয়ে দেবে বলে জানায়। অবশ্য যাওয়ার সময় ভুল করে সবগুলি টাকা পিয়নের হাতে আর বইটি অমলের হাতে দিয়ে চলে যায়। ঠিক যেমন ভুল করে চিঠির বদলে বইটি পোস্ট করে দিয়েছিল।

শুধু অমল নয় প্রতিটি কিশোর মনেই এক একজন শার্লক হোমস বাস করে। সদ্য শৈশব থেকে কৈশোর প্রাপ্ত মন নতুন কিছু জানতে চায় নতুন কিছু করতে চায়, নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে চায়। আর তাদের কাছে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ দেওয়ার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পথ হল গোয়েন্দাগিরি। আর শিশুরা অমলের মতোই ভাবতে পারে—

আপনি শার্লক হোমসের নাম শুনেছেন? বিখ্যাত গোয়েন্দা শার্লক হোমস? তাঁর কাছেই আমার গোয়েন্দাগিরি শেখা- যদিও অনেকটা একলব্যের মতই শেখা,[৫]

গোয়েন্দাধর্মী গল্পের পর যে গল্প কিশোর মনকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দেয় সেটা হল ভৌতিক গল্প। ভৌতিক গল্পের গা-ছমছমে আবহাওয়া কিশোররা অনেক উপভোগ করে। শিবরাম চক্রবর্তী অনেকগুলি ভৌতিক গল্প লিখেছেন। বলা বাহুল্য তার ভৌতিক গল্পের ভূতেরাও হাস্যরসিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ভূতই নয়। তার ভৌতিক গল্পের মধ্যে আছে *ভূতে বিশ্বাস করো, লক্ষণ এবং দুর্লক্ষণ, ভূত না অদ্ভুত, এক ভূতুরে কাণ্ড, বাজিকরের ডিকবাজি* ইত্যাদি।

এক ভূতুরে কাণ্ড গল্পটি নবপত্র প্রকাশন থেকে প্রকাশিত *শিবরাম অমনিবাস* এর ৯নং এবং ১৩নং খণ্ড থেকে নেওয়া হয়েছে। এই গল্পটি পড়ে বোঝা যায় ভূতের গল্পে যে ভূত থাকতেই হবে এমন কোন বাধ্য বাধকতা নেই। ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করাটাই মুখ্য। অধিকাংশ ভৌতিক চলচ্চিত্রেই দেখা যায় যতক্ষণ ভূত আসার পরিবেশ তৈরি হয় সে সময়টায় সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা অনুভব হয়। যখন ভূত এসে পরে তখন উত্তেজনা চরম মুহূর্ত থেকে আস্তে আস্তে নিচে নামতে থাকে। উক্ত গল্পে শিবরাম ভয় দিয়ে শুরু করে হাস্যরস দিয়ে শেষ করেছেন। একই ঘটনা সময় সাপেক্ষে ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন মাত্রা পায়। ঘটনাটি যখন উপরোপর বাহ্যিকভাবে দেখা হচ্ছিল তখন তা পাঠকমনে ভয় উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছে, যখন গল্প শেষে পূর্ণসত্য সম্পর্কে অবগত হয় তখন হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। গল্পকথক রাঁচির রাস্তায় সাইকেল দিয়ে মাইল সাতেক যাওয়ার পর টায়ার ফেঁসে যায়। রাতের বেলা পাহাড়ি জংলা অঞ্চলে বাঘের ভয়ের মধ্যে গ্রাম পেতে হলে আরও পাঁচ মাইল হাটতে হবে। আধঘণ্টা চিন্তা ও অপেক্ষার পর একটি লড়ি এলো এবং তা তার গন্তব্যের দিকেই চলে গেলো, টর্চের আলো দেখিয়ে হাত দেখিয়ে কোনও লাভ হয়নি। শেষে একটি বেবি অষ্টিন আসে। গাড়িটি এত আস্তে চলছিল যে মানুষ হাঁটলেও তার চেয়ে বেশি গতিতে চলতে পারে। এই গাড়িটিও থামছেনা দেখে কথক মরিয়া হয়ে গাড়িতে উঠে পরে। গাড়িতে উঠে নিজের গন্তব্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে কথকের গলার আওয়াজ উবে যায়- ড্রাইভার স্থান ফাঁকা, গাড়ির ইঞ্জিনও চলছিল না তবুও ড্রাইভারহীন গাড়ি চলছিল। কথক ভেবে সিদ্ধান্তে এলো শীতের রাতে কুয়াশার মধ্যে হেঁটে মরা বা বাঘের পেটে গিয়ে মরার চেয়ে ভূতের হাতে মরা অনেক ভালো।

এইকথা ভেবে, এবং হেঁটে যাওয়ায় চেয়ে বসে যাওয়ার আরাম বেশি বিবেচনা করে' প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে সেই ভূতুড়ে গাড়ীকেই আশ্রয় করে' রইলাম।[৬]

দুই ঘণ্টা পর গাড়িটা লেভেল ক্রসিং-এ এসেছে, এদিকে ট্রেনও আসছে কিন্তু গাড়ি থামার নাম নেই। কয়েক মুহূর্তের চড়ম উত্তেজনার পর কোনোরকমে কথক গাড়ি থেকে নেমে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে গাড়িও থেমে যায়।

এতটুকু পর্যন্ত ঘটনা একদিকে গড়াচ্ছিল, রসের আমূল পরিবর্তন হয় যখন পর-মুহূর্তে গাড়ির পেছন থেকে গাড়ির মালিক বেড়িয়ে আসেন। আট মাইল দূর থেকে কল বিগড়ানো গাড়ি ঠেলে নিয়ে আসছেন তিনি। গল্পের শেষে এসে ভয়ানক রস হাস্যরসে পরিণত হয়েছে। এখানেই শিবরামের কৃতিত্ব।

বাজিকরের ডিগবাজী ছোটোগল্পটিতে ভূত আছে কিন্তু একে ভৌতিক বলা যায় কিনা সেটা বিবেচনার বিষয়। গল্পের মূল নায়ক মলয় হলেও যাদুকর গণেশ গোঁসাই চরিত্রটি স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। অবশ্য তাকে গণেশ গোঁসাই না বলে স্বর্গীয় গণেশ গোঁসাই বলাই শ্রেয়। প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছিল গণেশ গোঁসাই, পরলোক থেকে ডিকবাজি খেয়ে মরলোকে এসেছে সে। নিজের পরিচয় দানকালে গণেশ জানায় তার ঠাকুরদা স্বর্গীয় শ্রী শ্রী মুকুন্দ গোঁসাই এর কাছে ভেলকি শিখেছে সে। ঠাকুরদা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় যাদুকর ছিলেন। গোপাল ভাঁড় কে ভাঁড় বানানোর কৃতিত্ব তার ঠাকুরদা মুকুন্দ গোঁসাই এর, এই কথা বলতেও সে।

অমিশুকে একাকীত্ব প্রেমী মলয় দেহাতে (গ্রামে) গিয়ে জীবনযাপন শুরু করে। তার বাড়ির পাশে একটি পোড়ো বাড়ি, বাড়িটির অবস্থা দেখে মলয় খুশিই হয়েছে এই কারনে যে সেখানে কখনো কেউ থাকতে আসবেনা। মলয়ের একটাই শখ শাকসবজি লাগানো। একদিন হঠাৎ দেখে পোড়ো বাড়িটা *যাদুকর গণেশ গোস্বামী* নামের ফলক লাগানো অবস্থায় ঝকঝক তকতক করছে। প্রতিবেশী প্রীতি মলয়ের কোন কালেই ছিলনা, তাই গণেশের অযাচিত কোশল বার্তা তার ভালো লাগেনা। অবিলম্বে মলয় বুঝতে পারে গণেশ গোস্বামী ভেলকি দেখাতে উস্তাদ। একদিন মত বিনিময়ের এক পর্যায়ে মলয় উত্তপ্ত হয়ে উঠলে যাদুকর তাকে গাধা বানিয়ে দেয়। গাধারূপী মলয় নিজের শখের সব্জি তছনছ করে কিছু খায় আর চিৎকার করতে থাকে। তার চিৎকারে বিরক্ত হয়ে গণেশ তাকে ইঁদুরে রূপান্তরিত করে কিন্তু পর মুহূর্তেই নিজের মৃত্যুর কারন মনে হয়ে যাওয়ায় মলয়কে পুনরায় মানুষ বানিয়ে দেয়। নিজের স্বরূপ ফিরে পেয়ে মলয় এক দৌড়ে ঘরে যায় এবং গাধা হয়ে যে বাঁধাকপি কাঁচা সব্জী আত্মসাৎ করেছে তা হজম হওয়ার জন্য হজমি খেয়ে বিছানা নেয়। সাতদিন পর মলয় হুশ ফিরে পেলে শুনে কারা এসে তার সব্জী বাগান নষ্ট করে দিয়ে গেছে। বাইরে গিয়ে পোড়ো বাড়িটাকেও আগের মতো পরিত্যক্ত রূপেই দেখে। মলয়ের ধারণা হয় এতদিন সে অসুস্থতায় বেহুশ ছিল, সব ঘটনা বোধহয় তার স্বপ্নে দেখা।

যাগগে- বলে ফিরে আসতেই লাউয়ের মাচায় তার নজরে পড়লো ! একী ! এটা তবে কী? গাধার এই আধা ল্যাজ এলো কোথথেকে? আমার এখানে- এই বাগানে?[৭]

লাউ মাচায় পাওয়া লেজ যেটা গাধা রূপে ছুটাছুটি করার সময় ছিঁড়ে গিয়েছিল। মলয় যত্ন করে নিজের লেজটা নিয়ে ঘরে কলমদানিতে রেখে দেয়।

শিবরাম চক্রবর্তী নিজের লেখা সম্পর্কে বলেছেন–

কোনো হিতোপদেশ নেই আমার লেখায়, আদর্শ স্থাপনের বালাই নেই কোনো, কোনো বাণী দিইনে আমি - সেই জন্যেই হয়ত শোনার যোগ্য মনে করে তারা।[৮]

এই কথাটা অনেকাংশে সত্য, শিবরামের গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল নির্মল হাস্যরসের সৃষ্টি। তাঁর গোয়েন্দা গল্প বা ভৌতিক গল্পগুলিও এর ব্যতিক্রম হয়নি। অধিকাংশ গল্পগুলিতে রহস্য-রোমাঞ্চের আড়ালে হাস্যরসের প্রয়োগ দেখা যায়। তাঁর গোয়েন্দা গল্প এবং ভৌতিক গল্পগুলি স্ব-মহিমা কতদূর পূরণ করতে পেরেছে তাতে প্রশ্নচিহ্ন থাকলেও গল্পগুলি যে পাঠকদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্র :

১) ভাব-বস্তু website থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।
২) ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা, নবপত্র প্রকাশন, পঞ্চম মুদ্রণ নভেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ২১৯
৩) *শিব্রাম অমনিবাস (দ্বাদশ খণ্ড)*, নবপত্র প্রকাশন, তৃতীয় মুদ্রণ: ডিসেম্বর, ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৮৬
৪) *শিব্রাম অমনিবাস (ত্রয়োদশ খণ্ড)*, নবপত্র প্রকাশন, তৃতীয় মুদ্রণ: কলকাতা পুস্তক মেলা ২০১৫ পৃষ্ঠা- ১৫৯
৫) *শিব্রাম অমনিবাস (ত্রয়োদশ খণ্ড)*, নবপত্র প্রকাশন, তৃতীয় মুদ্রণ: কলকাতা পুস্তক মেলা ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১৭০
৬) *শিব্রাম অমনিবাস (নবম খণ্ড)*, নবপত্র প্রকাশন, দ্বিতীয় মুদ্রণ: ডিসেম্বর, ২০০৯, পৃষ্ঠা- ১১০
৭) *শিব্রাম অমনিবাস (দশম খণ্ড)*, নবপত্র প্রকাশন, চতুর্থ মুদ্রণ: কলকাতা পুস্তক মেলা, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২৭
৮) ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা, নবপত্র প্রকাশন, পঞ্চম মুদ্রণ নভেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৭

গ্রন্থপঞ্জি :

আকরগ্রন্থ

১) শিবরাম চক্রবর্তী : *শিব্রাম অমনিবাস (নবম খণ্ড)*, দ্বিতীয় মুদ্রণ: ডিসেম্বর, ২০০৯, নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০৭৩
২) শিবরাম চক্রবর্তী : *শিব্রাম অমনিবাস (দশম খণ্ড)*, চতুর্থ মুদ্রণ: কলকাতা পুস্তক মেলা, ২০১৫, নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০৭৩
৩) শিবরাম চক্রবর্তী : *শিব্রাম অমনিবাস (দ্বাদশ খণ্ড)*, তৃতীয় মুদ্রণ: ডিসেম্বর, ২০১৪, নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০৭৩
৪) শিবরাম চক্রবর্তী : *শিব্রাম অমনিবাস (ত্রয়োদশ খণ্ড)*, তৃতীয় মুদ্রণ: কলকাতা পুস্তক মেলা, ২০১৫, নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০৭৩
৫) শিবরাম চক্রবর্তী : *শিব্রাম অমনিবাস (চতুর্দশ খণ্ড)*, তৃতীয় মুদ্রণ: ডিসেম্বর, ২০১৪, নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০৭৩

সহায়ক গ্রন্থ:

১) তাপস ভৌমিক (সম্পা): *শিরোনাম শিবরাম,* দ্বিতীয় প্রকাশ; জানুয়ারি ১৯৯৬, কোরক, ইএ ১/৮, দেশবন্ধুনগর, বাগুইআটি, কলকাতা- ৭০০০৫৯

সহায়ক পত্র-পত্রিকা:

১) *কথাসাহিত্য,* শিবরাম চক্রবর্তী জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, ৫৪ বর্ষ ৯ম সংখ্যা আষাঢ় ১৪১০ (জুলাই ২০০৩)
২) *যষ্টিমধু,* ৩০ বর্ষ, বর্ষশুরু ১৩৮৮, বৈশাখ- আষাঢ় ৮৮